আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও আল-ফিকহুল আকবার

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১০. ২. মুরজিয়া আকীদা

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিযোগ যে তিনি মুরজিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে আমরা মুরজিয়া মতের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মুরজিয়া অর্থ বিলম্বিতকারী, স্থগিতকারী অথবা আশাপ্রদানকারী দল। খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির এবং অনন্তকাল জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করেন। মুতাযিলী বিশ্বাসও প্রায় একই। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে খারিজী ও মুতাযিলীদের বিপরীত অন্য ফিরকার উদ্ভব হয় যারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান থেকে আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই যথেষ্ট। ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতে পারে। আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহ তার কোনো ক্ষতি করে না। যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী। এদেরকে মুরজিয়া বলার কারণ: (১) এরা বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন এজন্য তাদেরকে মুরজিয়াহ বলা হয়। (২) এরা আমল বা কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। (৩) এরা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের আশা প্রদান করেছে এজন্য তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়।[1]

এ দু প্রান্তিক ধারার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন মূলধারার আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পাপ ঈমানের ক্ষতি করে, তবে ঈমানকে ধ্বংস করে না বা শুধু পাপের কারণেই মুমিন ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হন না। বরং তার বিষয়টি আল্লাহর উপর অর্পিত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন। একারণে মুতাযিলী ও খারিজীগণ আহলুস সুন্নাত-কে মুরজিয়া বলে আখ্যায়িত করত। কারণ তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অনন্তকাল জাহান্নামী না বলে তার বিষয়টি বিলম্বিত ও স্থগিত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতেন। পাশাপাশি তাঁরা আমলকে ঈমান থেকে কিছুটা পিছিয়ে দিতেন বা অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ বলে গণ্য করতেন না। এভাবে আহলুস সুন্নাতের সকলেই মুতাযিলী ও খারিজীদের দৃষ্টিতে ‘‘মুরজিয়া’’।

অন্য দিকে শীয়াগণও ‘আহলুস সুন্নাহ’-কে ঢালাওভাবে মুরজিয়া বলতেন। শীয়া ধর্মমতে আলী (রা)-এর মর্যাদায় বিশ্বাসই ঈমান ও ইসলামের মূল বিষয়। তাঁদের মতে আলী (রা) সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু আহলুস সুন্নাত তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ না বলে চতুর্থ শ্রেষ্ঠ বলেন, অর্থাৎ তাঁকে আবূ বকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পরে স্থান দেন সেহেতু তারা ‘মুরজিয়া’, অর্থাৎ আলী (রা)-এর মর্যাদা বিলম্বিতকারী।

ইমাম আবূ হানীফাকে ‘‘মুরজিয়া’’ আখ্যায়িত করার বিষয়ে ইমাম শাহরাস্তানী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারীম ইবন আহমদ (৪৬৭-৫৪৮ হি) বলেন:

كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة ولعل

السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان والرجل مع تجرده في العمل (تبحره في العلم) كيف يفتي بترك العمل. وله سبب آخر وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا وكذلك الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج...

‘‘আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীদেরকে সুন্নী মুরজিয়া বলা হতো। অনেক লেখক তাঁকে মূল মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এর কারণ যে, তিনি বলতেন: ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস এবং ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এজন্য তারা ধারণা করেছেন যে, তিনি আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। যে মানুষ এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এত বেশি আমল করতেন তিনি কিভাবে আমল বর্জনের ফাতওয়া দিতে পারেন!? এর অন্য একটি কারণ রয়েছে। প্রথম যুগে (তাঁর যুগে) প্রকাশিত কাদারিয়া ও মুতাযিলীদের তিনি বিরোধিতা করতেন। আর কাদারিয়া মতের বিষয়ে যারাই মুতাযিলীদের বিরোধিতা করত তাদের সকলকেই মুরজিয়া বলত। খারিজীগণও তাই করত। এজন্য খুবই সম্ভব যে, মুরজিয়া আখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা মুতাযিলী ও খারিজীগণ থেকেই পেয়েছেন।...’’[2]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত একমত যে, আমল (কর্ম) ঈমানের (বিশ্বাসের) অবিভাজ্য অংশ নয় এবং শুধু কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মুমিন কাফির বলে গণ্য হন না। তাহলে ঈমান ও আমলের সাথে সম্পর্ক কী? মূলধারার মুহাদ্দিসগণের মতে আমল ঈমানের অংশ, তবে অবিভাজ্য অংশ নয়, বিভাজ্য অংশ। আমল বা কর্মের ত্রুটিতে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে বিনষ্ট হয় না। কর্মের বৃদ্ধি ও পূর্ণতায় ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে ঈমান হ্রাস পায়। তবে কোনোভাবেই কোনো কবীরা গোনাহের কারণেই মুমিন কাফির হন না।

পক্ষান্তরে প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিক থেকে অনেক ফকীহ বলেন: আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ নয়, বরং পরিপূরক। আমলের ত্রুটিতে ঈমান বিনষ্ট হয় না তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম। আর বিশ্বাসের বিষয় সর্বদা এক। এজন্য এতে কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। কর্মের হ্রাসবৃদ্ধির কারণে মুমিনের দীন, ইসলাম ও ঈমানের গভীরতায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় মূল ঈমানের বিষয়বস্তুর হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এ সকল ফকীহকে তাঁদের বিরোধীরা ‘‘মুরজিয়া’’ বলে আখ্যায়িত করতেন। ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন দ্বিতীয় ধারার অনুসারী। এ বিষয়ে তাঁর মত আমরা ফিকহুল আকবার গ্রন্থে দেখব। আমরা আরো দেখব যে, খারিজী ও মুতাযিলীদের প্রান্তিকতা, পাপী মুমিনকে কাফির-কথন প্রতিরোধ এবং জালিম বা ফাসিক রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রতিরোধের জন্য ফকীহগণ এ মত গ্রহণ করেন।

তাহলে আমরা দেখছি যে, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মধ্যে যে মতভেদ তা একান্তই ‘পরিভাষাগত’। খারিজী-মুতাযিলী প্রান্তিকতার প্রতিবাদে তাঁরা একমত যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিন কাফির নয়। মুরজিয়া প্রান্তিকতার প্রতিবাদে তাঁরা একমত যে, কবীরা গোনাহ মুমিনের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। মধ্যবর্তী সমন্বয়ে তারা দুটি বিষয়ে মতভেদ করেছেন: (১) কর্ম (আমল) বিশ্বাসের (ঈমানের) অংশ কি না এবং (২) আমলের কারণে মূল ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, ঈমানের শক্তি ও গভীরতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় একটি বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তা হলো ঈমানের ঘোষণার সাথে ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা। মুহাদ্দিসগণ বলতেন, মুমিন যেহেতু তার নিজের পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, এজন্য তার বলা উচিত: ‘ইনশা আল্লাহ

আমি মুমিন’। আর ফকীহগণ বলতেন, ইনশা আল্লাহ মূলত সন্দেহ প্রকাশ করে। আর একজন মুমিন যদি নিজের বর্তমান ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে ঈমানই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এজন্য বর্তমান ঈমানের অবস্থা বলতে মুমিন ‘ইনশা আল্লাহ’ ছাড়াই বলবেন; ‘আমি মুমিন’। তবে যদি তিনি তার ঈমানের ভবিষ্যত পরিণতির দিকে লক্ষ্য করে ‘ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন’ বলেন তাহলে অসুবিধা নেই।

এ সামান্য বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে ইমাম আবূ হানীফাকে মুরজিয়া, বিদআতী, কাফির ইত্যাদি বলে অনেক গালিগালাজ করা হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুৎ ‘ইনশা আল্লাহ’-র বিষয়। এ বিষয়টির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। ঈমানের ঘোষণার সাথে ‘ইনশা আল্লাহ’ বলতে হবে বা হবে না- এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোনোরূপ নির্দেশনা নেই। বিষয়টি একেবারেই ইজতিহাদী। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক কঠোর কথা বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিববান, ইবন আদী, খতীব বাগদাদী প্রমুখের গ্রন্থে পাঠক তা দেখবেন। আমরা আগেই বলেছি, ইমাম আবূ হানীফা এ ধারার অনুসারী ছিলেন, প্রবর্তক ছিলেন না। ইমাম আবূ হানীফার পূর্বেই অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ এ মত গ্রহণ ও প্রচার করেন। হাদীস বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনায় আমরা হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের অনেক প্রসিদ্ধ মুরজিয়া মুহাদ্দিস ও ফকীহের নাম দেখব। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা যেমন আক্রমণ ও চরিত্র হননের শিকার হয়েছেন তেমন আর কেউ হন নি। বাহ্যত এর কারণ প্রসিদ্ধির ঈর্ষা, মাযহাবী কোন্দল ও প্রতিহিংসা।

ফুটনোট

[1] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ১/৯৮; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০২।

[2] শাহরাসত্মানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৪০-১৪২; লাখনবী, আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল, ৩৫২-৩৬২।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7050

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন